চিত্তরঞ্জন







আশুতোষ লাইব্রেরী
ঢাকা ও কলিকাতা

তিন আনা সংস্করণের জীবনীমালা

ষড়বিংশ

চিত্তরঞ্জন



শ্রীহরিশচন্দ্র সেনগুপ্ত
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্‌
আশুতোষ লাইব্রেরী
৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৩২



ঢাকা
আশুতোষ প্রেসে
শ্রীরেবতীমোহন দাস-দ্বারা মুদ্রিত

প্রথম সহস্র

চিত্তরঞ্জন

এক

"জীবন মরণ সবই মায়া তত্ত্বজ্ঞানী বল্‌চে ওই,
আগল-ভাঙ্গা পাগল বুকের কাঁদন তাতে থাম্‌চে কই ?
মায়ের মত কোমল যিনি বজ্র সম সুকঠোর,
রে বাঙ্গালি, কাঁদো তুমি তাহার শোকের নাহি ওর।"

আচম্বিতে বাংলা মায়ের বুকে এক বিষম বজ্র পড়িল। হিমালয়ের বক্ষে বাংলার গৌরব-রবি ডুবিয়া গেল। ১৩৩২ সালের ২রা আষাঢ় মঙ্গলবার বৈকালে পাঁচটার সময় বঙ্গ জননীর বুকের ধন চিত্তরঞ্জনকে করাল কাল অকালে ছিনাইয়া লইয়া গেল। বাংলার ঘরে দারুণ শোকের আগুণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

দেশবন্ধু ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। "তাঁহার অভাবে পিতৃশোক, ভ্রাতৃশোক, পুত্রশোক যেন যুগপৎ সমস্ত

দেশটাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তিনি কার্য্যে পিতৃ-হীনের পিতা ছিলেন, ভ্রাতৃহীনের ভ্রাতা ছিলেন এবং পুত্র-হীনের পুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্য আজ বঙ্গের সকলেরই চোখে জল,—মুখে হাহাকার, হৃদয়ে শোকানল। সেই চিত্তরঞ্জন আজ নাই—নাই,—চিরকালের মত নাই"।

যিনি প্রীতি ও ভালবাসা দিয়া ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকলকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, যিনি মহর্ষি দধিচির মত নিজের দেহ পাত করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, ভারতের কল্যাণ সাধনের জন্য যাঁহার আবির্ভাব, সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জীবনের দুই চারিটী কথা তোমাদিগকে বলিতেছি।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার তেলিরবাগ গ্রাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পৈত্রিক বাসভূমি। তাঁহার পিতার নাম ভুবনমোহন দাশ। ইহারা সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশের সন্তান। এই বংশে রতনকৃষ্ণ দাশ স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তিনি যেমন দানশীল, তেমন অতিথিপরায়ণ ছিলেন। লোকে মুখে মুখে রতনকৃষ্ণের অলৌকিক গুণ গরিমার কথা কহিয়া বেড়াইত। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদ্বন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতামহ। জগদ্বন্ধু একজন প্রসিদ্ধ মোক্তার ছিলেন। মোক্তারীতে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

দাশ-পরিবার চিরকালই দানশীলতার জন্য বিখ্যাত। জগদ্বন্ধু যাহা উপাৰ্জ্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশই নিরন্ন আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণ ও গ্রামের অতিথি-শালার জন্য খরচ করিতেন। শুধু টাকা পাঠাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। নিয়মিতভাবে অতিথি-সেবা হয় কিনা তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেন। একবার তিনি দুপুর রাতে ছদ্মবেশে নৌকা করিয়া গ্রামের ঘাটে আসিয়া লোক পাঠাইয়া অতিথিশালায় খবর দিলেন যে, একজন ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আসিয়াছেন। রাত্রি অধিক দেখিয়া কর্ম্মচারীরা উঠিয়া কেহই অতিথির অভ্যর্থনা করিল না। অগত্যাপক্ষে তাঁহাকে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইল। জগদ্বন্ধু ঘরে আসিয়া কর্ম্মচারীদের ডাকাইলেন। তাহাদের বলিয়া দিলেন, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটিলে তাহাদের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

জগদ্বন্ধুর খুল্লতাত ভ্রাতা কাশীশ্বরের তিন পুত্র,—কালীমোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন। জগদ্বন্ধু ভুবনমোহনকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভুবনমোহন কালকাতা হাইকোর্টের একজন সুপ্রসিদ্ধ এটর্নি ছিলেন। ভুবনমোহনের পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। কিন্তু ভুবনমোহন সেকালের ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার ঘৃণার ভাব আসিয়া পড়িল; শেষটায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ

করিলেন। ভুবনমোহন একা ব্রাহ্ম হইলেন না, তিনি দুর্গামোহন দাশকেও সাথী করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইলেও ভুবনমোহন হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। হিন্দু সমাজভুক্ত আত্মীয় স্বজনের সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতি পাইত। বিপন্ন বন্ধুবান্ধবের ভরণ পোষণ করিতে তিনি কখনও ক্রুটী করিতেন না। হাতে টাকা না থাকিলে, ঋণ করিয়াও সাহায্য করিতেন, তথাপি তাহাদিগকে বিমুখ করিতেন না। একবার একটী লোক বিষম বিপদে পড়িয়া ভুবন বাবুর নিকটে আসিয়া পড়িল। লোকটী কাতর বাক্যে বলিল, "আমি ঘোর বিপদে পড়িয়া আজ আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আমার জন্য চল্লিশ হাজার টাকার জামিন হইলে আমি উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি।" এই কথা শুনিয়া ভুবনমোহনের হৃদয় গলিয়া গেল। ভাবী ফলাফল ভাল মন্দ তিনি কিছুই গণিলেন না,—টাকাটা আদায় হইবে কিনা একবার চিন্তা করিয়াও দেখিলেন না। নিঃসন্দেহ মনে ভুবনমোহন জামিন পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু যাহার জন্য ভুবনমোহন এতটা করিলেন, সে আর ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিল না। এই নিমকহারামের ফাঁদে পড়িয়া, তিনি সর্ব্বস্ব

হারাইলেন। ভুবনমোহন চল্লিশ হাজার টাকার দেনার দায়ে পড়িলেন।

ভুবনমোহন দাশের তিনপুত্র, চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন ও বসন্তরঞ্জন। ১২৭৭ সালের ২০শে কার্ত্তিক (ইংরাজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর) কলিকাতা মহানগরীতে চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। কথিত আছে, চিত্তরঞ্জনের বংশের বহুলোক প্রাচীনকালে আমাদের এই বাংলার কোন কোন অংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। জ্ঞানে পুণ্যে, উদারতায় ও স্বাধীনতাপ্রিয়তায় এই প্রাচীন বংশ সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের জননীর নাম নিস্তারিণী দেবী। নিস্তারিণী দেবীর মত এমন উদারমতি, স্বজনবৎসল, সেবানিষ্ঠ নারীচরিত্র বর্ত্তমান সময় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একজন আদর্শ পতিব্রতা রমণী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়াছিলেন। "জন্মে জন্মে যেন এই স্বামী এবং চিত্তকে পুত্ররূপে পাই।" দুর্দ্দশাপন্ন জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের সংসারভার বহন করিতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত ছিলেন না। ভুবনমোহন ব্রাহ্ম হইলেও নিস্তারিণী কোনও দিন আজকালকার 'ইঙ্গবঙ্গ' সমাজের আচার ব্যবহার অবলম্বন করেন নাই। তিনি কোন দিনও ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যের হাতের অন্ন গ্রহণ করিতেন না।

এমন পিতামাতার সন্তান কখনও মন্দ হইতে পারে না, ছোট হইতেও পারে না। চিত্তরঞ্জন বড় হইয়া যে একজন বড়লোক হইবে, শৈশবেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী বাসন্তী দেবীর নিকট লিখিয়াছেন, "চিত্তরঞ্জনকে আমি তাঁহার বাল্যকাল হইতেই জানি। তোমার শ্বশুর-পরিবারের সহিত তখনকার দিনে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সামান্য কোন মেয়েলী ক্রিয়াকর্ম্মেও দাশমহিলাগণ আমাদের অন্তঃপুরে নিমন্ত্রিত হইতেন। তোমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী এরূপ সময়ে প্রায়ই দুএকটী ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সে আজ বহুদিনের কথা, চিত্তরঞ্জনের বয়স বোধ হয় ছয় সাত বৎসরের অধিক নহে। মাতার সহিত বালক যখন মেয়ে-মজলিসে আসিয়া দাঁড়াইত, চেহারা ও নামে তাঁহার পরিপূর্ণ মিল দেখিতে পাইতাম। চোখ দুটী ছিল তাঁ'র বুদ্ধি-সমুজ্জল এবং মুখখানি ছিল বেশ্ একটু ভাবগম্ভীর। বাল-মুখে বালসুলভ সেই গাম্ভীর্য্যটুকু আমার বড়ই মিষ্ট লাগিত। তাঁহার দিকে চাহিয়া নয়ন যেন তাহাতে বাঁধা পড়িয়া যাইত। একদিন এই বালকের এই চিত্তরঞ্জন রূপ মুগ্ধ নয়নে দেখিতে দেখিতে তোমার শাশুরী ঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলাম, "আপনার এই ছেলেটী দেখ্‌ছি, বড় হয়ে নিশ্চয়ই একদিন বড়লোক হবে। সেদিন হাসিতে হাসিতে যে কথা

বলিয়াছিলাম, ভবিষ্যদ্বাণীর মতই পরে বর্ণে বর্ণে তাহা সফল হইয়াছে।”

কলিকাতায় থাকিয়াই চিত্তরঞ্জন বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই মিশনারী স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া, চিত্তরঞ্জন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি ১৮৮৮ সালে এফ, এ পরীক্ষায় ও ১৮৯০ সালে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার অনার্স পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে নম্বর কম হওয়ায় তিনি অনার্স পাইতে পারিলেন না। ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল।

দুই

কলেজে অধ্যয়ন কালে যেমন সাহিত্যে, তেমনি বাগ্মিতায় চিত্তরঞ্জন অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। সমপাঠী ও অধ্যাপকগণ সকলেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া বিস্মিত হইতেন। তাঁহার সময়ে ছাত্রমহলে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই ছিল না।

চিত্তরঞ্জন প্রথম জীবন হইতেই অতিশয় ভাবপ্রবণ ছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার সময় এক বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়াছিলেন,—"তোমাদের সবার মাঝে দেশমাতৃকা তাঁরই ইচ্ছামূর্ত্তি পরিগ্রহণ করে' জাগে। সে নারী কে জানিনা। এই শুধু জানি, সে জননী সকল জাতির। আজ উন্নত শিরে বলি, হে জননী বঙ্গ, তোমার নদী তড়াগ ধন্য হক্, ধন্য হক্ তোমার পুষ্পিত তরুলতা, ধন্য হক্ তোমার সন্তান সন্ততিরা"।

পুত্র উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, রাজভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছেন, ইংলিশ ফ্যাসনে আদব কায়দা বুঝিয়াছেন, কাজেই ভুবন বাবু চিত্তরঞ্জনকে বিলাত পাঠাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার একান্ত সাধ হইল,

পুত্রকে বিলাতে পাঠাইবেন, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট একটা কিছু হাকিম তৈয়ারী করিয়া দেশে আনিবেন। বাঙ্গালী চিরকালই চাকরীটাকে চরম ও পরম পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করে।



চিত্তরঞ্জন

ভুবনমোহনও কোনমতেই স্বজাতির প্রকৃতি ছাড়াইতে পারিলেন না; পাশ করিয়া একবার দেশের মাটিতে পা

দিলেই মাসমাহিনা পাঁচশ টাকা, একি কম কথা! এইত গেল টাকার কথা, আবার তার উপর মানসম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি তাও ত কম নয়। হাকিমি পদপ্রাপ্তি, এর চাইতে আর বেশি প্রাপ্তি কি হইতে পারে। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের বিলাত যাত্রা ঠিক হইল। তিনি হাকিমির পথে চলিলেন।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ব্রাহ্ম। কাজেই কালাপানির ভয় করিবার কিছুই নাই। মনে কোন কিছুর ভয় না করিয়া চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন। বিলাত যাইয়া তিনি নিয়মিত রূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, পরীক্ষা পাশের জন্য বেশ্ করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়স ২১ বৎসর মাত্র। এই বয়সেই তাঁহার অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিলাতের অনেক সভাসমিতিতে এই বাঙ্গালী যুবক বিদেশী ভাষায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহার বাগ্মিতায় ইংরেজগণ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার যশোগান করিতে লাগিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে চিত্তরঞ্জনের মধ্যে যে প্রতিভার অঙ্কুর উপ্ত হইয়াছিল, বিলাতী হাওয়ায় সে অঙ্কুর পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। স্কুল কলেজের গণ্ডীর ভিতর চিত্তরঞ্জনের শিক্ষা কোনোদিনও সীমাবদ্ধ ছিল না। কি সাহিত্যে, কি ইতিহাসে, কি রাজনীতি বিষয়ে—কোনটাতেই তিনি আলোচনার ত্রুটী করিতেন না।

তিনি মনে করিতেন, কেবল পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না, প্রকৃত মানুষ গড়িয়া উঠা যায় না। প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে এগুলি ছাড়া আরো কিছুর অনুশীলন করা আবশ্যক। এই ভাব হৃদয়ে জাগাইয়া আপনার প্রাণটী তিনি উদার করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন বাহিরের বিষয় এবং মানুষ এই উভয়কে চিনিয়া লইতে শিখিলেন। এইরূপে তাঁহার মনুষ্যত্ব ফুলের কুঁড়ির মত তিলে তিলে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

চিত্তরঞ্জন যখন বিলাতে তখন দাদাভাই নৌরজী পার্‌লামেণ্টের সদস্য হইবার সবিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। দাদাভাইয়ের যেমন দেশের জন্য টান ছিল, চিত্তরঞ্জনেরও তেমনি দেশের জন্য প্রাণ ছিল। জন্মভূমিকে মায়ের মত তিনি ভালবাসিতেন। আপনার জন্মভূমিকে অনাবিল ভালবাসা যাহার অস্থি মজ্জায় বসিয়া গিয়াছিল, সে লোক কি আর দাদাভাইয়ের মত লোকের পাশে না দাঁড়াইয়া ঘরের কোণে চুপটী করিয়া গা ঢাকা দিতে পারেন? চিত্তরঞ্জন দাদাভাইর পক্ষ সমর্থন করিয়া বিলাতের বহু সভায় বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতা এমন সারগর্ভ ও সুন্দর হইয়াছিল যে, উহা শুনিয়া বিলাতের লোকে মুগ্ধ হইয়া গেল। বিলাতের বড় বড় খবরের কাগজে চিত্তরঞ্জনের প্রশংসা বাহির হইল। চারিদিকে "জয় জয়" ধ্বনি হইতে লাগিল।

উল্লিখিত ঘটনার কিছুদিন পরে পার্লামেণ্টের একজন সদস্য মিঃ জন্ ম্যাক্লীন ভারতের হিন্দু ও মুশলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। হিন্দু মুশলমানের বিরুদ্ধে ম্যাকলীন সাহেবের প্রকাশিত মন্তব্য চিত্তরঞ্জনের প্রাণে বড় লাগিল। উহা যেন সূঁচের মত তাঁহার বুকের মধ্যে বিঁধিয়া গেল। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। উহার প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত তিনি সমস্ত ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদিগকে এক সভায় ডাকিলেন। সেই সভায় চিত্তরঞ্জন জ্বালাময়ী ভাষায় এক বক্তৃতা দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তারপর বিলাতের উদারনৈতিক দলের প্রকাশ্য সভায় ঐ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিলেন প্রাচীন ভারত যখন সভ্যতা ও শিক্ষার আলোকে আলোকিত, তখন ইয়োরোপের অনেক জাতি অজ্ঞান আঁধারে আচ্ছন্ন ছিল। উদারনৈতিক দলের নেতা ছিলেন মহামতি মিঃ গ্ল্যাড্-ষ্টোন্। চিত্তরঞ্জন যে সভায় বক্তৃতা দিয়া ছিলেন, মহানুভব মিঃ গ্ল্যাড্ষ্টোন সেই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বাধিত করিয়াছিলেন। এই উদারনৈতিক দলের লোকেরাও ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ আরম্ভ করিতে লাগিলেন।

চিত্তরঞ্জনের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। মিঃ ম্যাকলীন ক্ষমা চাহিতে ও পারলামেণ্টের সদস্যের পদ ছাড়িয়া দিতে

বাধ্য হইলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে চিত্তরঞ্জন এক সভায় ভারতীয় অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। এই সভায়ও সভাপতি হইয়াছিলেন মিঃ গ্ল্যাড্‌-ষ্টোন্। এই সভায় দাঁড়াইয়া চিত্তরঞ্জন ভারতের দুর্দ্দশাপন্ন ও হীন অবস্থা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। এরূপ সৎসাহসী ও স্বজাতিবৎসল যুবক ভারতমাতার কোলে অতি অল্পই স্থান লাভ করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইয়াছে। তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার ফলে তাঁহার কর্ম্মের ধারা বদলিয়া গেল। যাহার জন্য তিনি সাত সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তাহা আর মিলিল না। শুনা যায়, চিত্তরঞ্জন যোগ্যতার সহিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ হইলেও, এই বক্তৃতার জন্য তাঁহার নাম শিক্ষানবিশের তালিকা হইতে কর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয়। তিনি সিভিল সার্ভিস হইতে বঞ্চিত হইলেন।

বিলাতে থাকিয়া চিত্তরঞ্জন যে কেবল আইনের পুঁথি ঘাটিয়াছেন, সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়া নিজের জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তা' নয়। আইন অধ্যয়ন কালে চিত্তরঞ্জন একখানা নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটকখানা এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল যে, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা স্যার হেন্‌রি আর্‌ভিং শত মুখে উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

তিন

চিত্তরঞ্জনের জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ হওয়ার পথ কণ্টকিত হইল। তিনি সেপথ ছাড়িয়া অন্য পথে পা দিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা আশা করিয়াছিলেন, সিভিলসার্ভিস পাশ করিলে সংসারের কষ্ট দূর হইবে। মানুষ না বুঝিয়া অনেক সময় নিজের কল্পনায় যাহা ভাল মনে করে, বিধাতার বিধানে তাহা মন্দ হইয়া দাঁড়ায়।

তাঁহার পিতা ভুবনমোহন ঋণজালে জড়িত। ঘরে অর্থের নিতান্ত অনটন। কাজেই চিত্তরঞ্জনের অকৃতকার্য্যতায় সকলেই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। কিন্তু দাশ পরিবারের যাহা দুঃখের কারণ হইয়াছিল, দাশ পরিবারের দেশবাসীর তাহা সুখের সোপান হইয়া গেল।

চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টারী পড়া সুস্থির করিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরিলেন। দেশে আসিয়া সেই বৎসরই তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে ভুবনমোহন দানের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া শেষে নিজেই কাঙ্গাল হইয়া পড়িলেন। যে প্রবঞ্চক ভুবনমোহনকে চল্লিশ হাজার টাকার দায়ে ফেলিয়া গা ঢাকা দিয়াছিল, শেষ

কালে অনেকটা তারই জন্য তাঁহাকে দেউলিয়া বনিতে হইয়াছিল। দেউলিয়া হইয়া তাঁহার কষ্টের অবধি রহিল না; দিবানিশি মনে অশান্তির আগুণ জ্বলিতে লাগিল। এহেন সঙ্কটের সময়ে চিত্তরঞ্জনের ব্যারিষ্টারীর আরম্ভ। এই ব্যবসায়ের ভাবীফল অনিশ্চিত। প্রথম প্রথম পশার প্রতিপত্তি কিছুই নাই। ব্যবসায়ে মোটে "হাতে খড়ি"। এমন বান্ধব কে আছে যে কিছু কিছু মামলা মোকদ্দমার কাজ দিয়া তাঁহার সাহায্য করিবে? ভয়ানক জীবন-সংগ্রামে পড়িয়া চিত্তরঞ্জন বড়ই আকুল হইয়া পড়িলেন।

পিতার দুঃখ দারিদ্র্য ও মানসিক অশান্তি পুত্রের হৃদয়ে বৃশ্চিকের মত দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু দংশন করিলে হইবে কি? তিনি ত উপার্জ্জনে অসমর্থ। পিতা দেউলিয়া বনিয়া নগণ্য হইয়া থাকিবেন, আর তিনি পুত্র হইয়া পিতার কষ্টের ভাগ লইবেন না, ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি মহাজনদিগকে ডাকাইলেন। ডাকাইয়া বলিলেন, আমিও আপনাদের ঋণ-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দেউলিয়া হইব। তিনি দেনার খতে দস্তখত করিয়া দেউলিয়া নাম কিনিলেন। সমস্ত ঋণভার নিজের কাঁধে লইলেন।

তিনি ঋণভার গ্রহণ করিলেন সত্য, কিন্তু ঋণ শোধের উপায় কি? সংসারে প্রবেশ করিয়াই এই ঝঞ্ঝাট; তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এমন সঙ্কটে পড়িয়াও তিনি

নিরাশ হইলেন না। তাঁহার এমন একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আরম্ভ এমন কণ্টকময় হইলেও, একদিন না একদিন তিনি জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন। ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া তাঁহাকে দিন দিন জীবনপথে অগ্রসর হইতেই হইবে। পাওনাদারদের চোখে ধূলা দিয়া অধর্ম্মের কাজ করার সঙ্কল্প তাঁহার মনে জাগিল না। সময় হইলে সকলের দেনাই কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিবেন, এইভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত মনে কাজ কর্ম্ম করিবার জন্য দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখাইয়াছিলেন।

বিলাতে গেলে সচরাচর বাবুরা সাহেব সাজিয়া দেশে ফিরেন। দেশী পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, দেশীভাষা— কিছুই তাঁহাদের ভাল লাগে না। যে ভাবেই হউক হ্যাটকোট পড়িবে, নেকটাই বাঁধিবে, বিলাতী ঢংএ চলিবে। নেটিভদের আর কোনটাতেই মন উঠিবে না। আমাদের একজন সুরসিক কবি গাহিয়া গিয়াছেন, "আমরা বিলাতী ধরণে হাসি, ফরাসি ধরণে কাশি, আর পা ফাঁক করে' সিগারেট খেতে বড্ডই ভালবাসি।" আমাদের চিত্তরঞ্জনের গায়েও যে উহার একটু বাতাস না লাগিয়াছিল, এমন নহে। প্রথম জীবনে চিত্তরঞ্জন মিঃ সি, আর, দাশই ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও অনেক বিষয়ে তাঁহার আসল প্রকৃতি

ফুটিয়া উঠিত। এদেশের সাহিত্য-সেবায়, দরিদ্র-সেবায়, স্বজন সেবায় তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হইত!

১৮৯৮ সালে বিজনী ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ হালদারের কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সহিত চিত্তরঞ্জনের শুভ বিবাহ হয়। বাসন্তী দেবী একজন আদর্শ-চরিত্রা রমণী। বাসন্তী দেবী আদর্শচরিত্রের নারী বলিয়াই, চিত্তরঞ্জন বড়ঘরে বহু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব লইয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বামীর সকল কর্ম্মে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করা বাসন্তীর চরিত্রগত ধর্ম্ম। একজন কবি বাসন্তীর গুণ গান করিয়া লিখিয়াছেন—

"কে তুমি মা, দেবীরূপে এসেছ এদেশে,
ঘুচাতে ব্যাথার জ্বালা, বঙ্গনারী বেশে।
রমণী অসূর্য্যম্পশ্যা সুখেতে লালিতা,
ধনৈশ্বর্য্য সম্পদের কোলেতে পালিতা।
দয়া স্নেহ দেশপ্রেম একাধারে আনি,
গড়িলেন বিধাতা কি তোমারে জননী?

* * * *

ধন্য জন্মভূমি, ধন্য কলিকাতা বাসী,
তব পুণ্য পাদস্পর্শে হেথা গয়াকাশী॥
তব শান্ত শুদ্ধ মূর্ত্তি বঙ্গবাসী সেবি
ধন্য হবে চিরকাল, হে বাসন্তী দেবী।"

"হিন্দু ধর্ম্মের শস্ত্রকারগণ সহধর্ম্মিণীর যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, বাসন্তী দেবীতে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রযোজ্য। তিনি শোকে স্বামীর সান্ত্বনা দায়িনী, তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চায় সহযোগিনী, তাঁহার কাব্যের নিরপেক্ষ পাঠক ও সমালোচক এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার দেশব্রতে সহকর্ম্মিণী। তাঁহার দেবর ও ননদিনীরা তাঁহাকে মাতৃতুল্যা জ্ঞান করেন, এবং খুব সম্ভ্রমের চক্ষে দেখেন। তাঁহার ব্যবহারে তাঁহাকে ভয় না করিয়া শুধু জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিতেই শিক্ষা দেয়।"

অনেকে পুণ্যের ফলে এমন আদর্শ গৃহিণী সংসারে মিলে। এমন গৃহিণীর আগমনে গৃহ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার না হইয়া পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পিতার গুরুতর ঋণভার মাথায় লইয়া চিত্তরঞ্জন ব্যারীষ্টারী আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি চিরকালই স্বাধীনচেতা ছিলেন। পরপ্রত্যাশী না হইয়া আত্মচেষ্টায় উন্নতি লাভের জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন। শাস্ত্রে আছে উদ্যোগী পুরুষসিংহকে লক্ষ্মী কৃপা করেন; কেবল কাপুরুষেরাই দৈবের উপর নির্ভর করিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে। তিনি নিজের পুরুষকারের বলে যথাসাধ্য ভাগ্যোন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা হাইকোর্টে ভয়ানক প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনও উকীল ব্যারিষ্টারের সহজে

পশার হইয়া উঠিতে পারে না। যাঁদের সহায় মুরুব্বি থাকে, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র ; কিন্তু মুরুব্বীহীনের পক্ষে ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করা বড়ই কষ্টকর। প্রথম প্রথম চিত্তরঞ্জন মফঃস্বলের নিম্ন আদালতে মোকদ্দমার ভার লইয়া মফঃস্বলে যাইতেন। সেই সময় তিনি নিবিষ্ট মনে আইন অধ্যয়ন করিতেন। পরীক্ষা পাশ করিয়া কেহ কিছু শিখিতে পারে না, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কাজেই যোগীর যোগ সাধনের ন্যায় তিনি আইন পুস্তকগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। ব্যারিষ্টারীর প্রথম জীবনে চিত্তরঞ্জন যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষার্থী মাত্রেরই শিক্ষণীয়।

পরিশ্রম কখনও নিষ্ফল হয় না। ভগবান চিত্তরঞ্জনকে অসাধারণ প্রতিভা দিয়াছিলেন। এই অসাধারণ প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রম পরস্পর মিলিত হইয়া চিত্তরঞ্জনের উন্নতির পথ সুগম করিয়া দিল। অবশেষে তাঁহার প্রতিভা-বিকাশের এক মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইল। অমাবস্যা গত হইয়া শুক্লা প্রতিপদ দেখা দিল। যখন লর্ড কার্জ্জন ভারতের রাজপ্রতিনিধি, তখন বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই বঙ্গ-বিচ্ছেদের ফলে দেশে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত। চারি দিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এই সময় আলিপুরের বোমার মামলা উপস্থিত হয়; কলিকাতায় এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ে। কানাই, খুদীরাম,

বারীন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি যুবকগণ ঐ বোমার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলিয়া অভিযুক্ত হইল। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষও এই ঘটনায় দোষী আছেন বলিয়া, বেড়াজালে ঘেরা পড়িলেন। ১৯০৯ সালের আলিপুরের বোমার মামলা একটা সর্ব্বজন-বিদিত ঘটনা। রাজবিদ্রোহের ষড়যন্ত্র, গুরুতর ঘটনা, ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত! সমস্যা দাঁড়াইল, এই মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবেন কে? সরকার পক্ষে বড় বড় ব্যারিষ্টার.— এই মোকদ্দমা চালাইতে সাহস লাগিবে, যোগ্যতা লাগিবে, সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগস্বীকারও করিতে হইবে। দুই চার দিন মোকদ্দমা চলিবে না, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে হইবে, কিন্তু পরিশ্রম যে পরিমাণ, টাকা সে পরিমাণ মিলিবে না।

গুণীই গুণীকে চিনিয়া লইতে পারে। অরবিন্দ বুঝিতে পারিলেন, এই বিষয়ে একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি চিত্তরঞ্জন। তিনি ভিন্ন আর কারো দ্বারা একার্য্য সম্পন্ন হইবে না। চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষে দাঁড়াইলেন। গভর্ণমেণ্ট পক্ষে দাঁড়াইলের ব্যারিষ্টার মিঃ নর্টন। পূরা আট মাস কাল মোকদ্দমা চলিল। কত জেরা, জবানবন্দি নানা প্রকার তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। সকলেই আগ্রহ সহকারে উভয় ব্যারিষ্টারের বাক্‌বিতণ্ডা, তর্ক বিতর্ক শুনিতে লাগিল। মামলার শেষ তারিখে আদালতগৃহ লোকে

পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সকলেই ব্যগ্র,—চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা শুনিবে। সে দিন দেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। যেমন ওজস্বিনী ভাষা, তেমন প্রাণস্পর্শী ভাব। ভাষার এমন মধুরতা, এমন উন্মাদনা, যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। বিচারপতি একমনে চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা শুনিলেন। শুনিয়া তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

সেই মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণে আদালত ঘরে যত উকীল, ব্যারিষ্টার, অপর শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। অবশেষে রায় বাহির হইল। অরবিন্দ নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়া বেকসুর খালাস পাইলেন। সত্যের জয় না হইয়া পারে না। চিত্তরঞ্জন উৎফুল্ল হইয়া অরবিন্দের হাত ধরিয়া আদালত কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। চিত্তরঞ্জনের পরিশ্রম সার্থক হইল। তাঁহার ত্যাগ, একনিষ্ঠা ও যোগ্যতার কথা কারো বুঝিবার বাকী রহিল না। এই ঘটনায় তিনি এক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত, আর এক দিকে মহা লাভবান হইয়াছিলেন। এই লোকশানে লাভের বীজ অঙ্কুরিত হইল। এই মামলার পরেই দেশদেশান্তরে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িল। সবাইর মুখেই চিত্তরঞ্জনের নাম। ঘরে আর মক্কেল ধরে না।

চার

ইহার কিছু দিন পরে ঢাকার ষড়যন্ত্রের মামলা উপস্থিত হয়। এবারও তিনি আসামীর পক্ষে দাঁড়াইলেন। এই মোকদ্দমায়ও চিত্তরঞ্জন ত্যাগের পরিচয় প্রদান করিলেন। এই সমুদয় মামলায় তিনি মোটেই টাকা পয়সা লন নাই। এই ত্যাগ তাঁহার ভাগ্যোন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। লোকে কথায় বলে, "এক দিলে আর পায়"। চিত্তরঞ্জনের কাজে আমার উহার সত্যতা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি।

এখন সকলেই চিত্তরঞ্জনকে ব্রীফ্ দিতে ব্যস্ত। সকলেরই বিশ্বাস হইল, তাঁহার মত আইনজ্ঞ ও বক্তা কালিকাতা হাইকোর্টে দ্বিতীয়টী নাই। পাথর-চাপা কপালের উপর হইতে পাথর সরিয়া গেল। তাঁহার বিস্তর অর্থোপার্জ্জন হইতে লাগিল। কে যেন দুই হাতে ঠেলিয়া তাহার ঘরে টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। টাকার ঝন্‌ঝনিতে অনেকেরই মাথা ঘুড়িয়া যায়, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মাথা ঘুড়িলনা।

পিতৃঋণের কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি মহাজনদিগকে ডাকাইলেন। ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া পিতাকে ঋণমুক্ত

করিলেন। পিতাপুত্র ঋণমুক্ত হইয়া দেউলিয়া নাম দূর করিলেন। তিনি নিজের উপার্জ্জনের টাকা হইতে কড়ায় গণ্ডায় মহাজনদের বুঝাইয়া দিলেন। আইন অনুসারে কাহারও ঐ টাকা দাবি করিবার অধিকার ছিল না। তথাপি তাঁহার হৃদয়ের উদারতা, আচরণে সাধুতা তাঁহাকে এই কাজে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। এই ঋণ দু' চার টাকা নয়, ৬৪ হাজার টাকা। বিচারপতি ফ্লেচার সাহেব মুক্তি পত্রের রায়ে লিখিয়াছিলেন—"এমন অযাচিত ভাবে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দেউলিয়া নাম ঘুচাইবার চেষ্টা আমি আর দেখি নাই।" মহাজনেরা দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

তিনি কি করিয়া যে একজন বড় ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন, তাহা নিজেই জনৈক বন্ধুর কাছে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ছিলেম কবি, হলেম ব্যারিষ্টার। তোমরা সকলে জান, আমি মস্ত ব্যারিষ্টার, খুব আইন জানি। সে সব কিছুই নয়। ব্রিফ্ পেয়েই আগে তোমরা আইনের পাতা ওল্টাতে থাক, আমি সব প্রথমে আগাগোড়া ব্রিফ্‌খানা পড়্‌তাম। এরূপ বরাবর পড়্‌তাম, পড়্‌তে পড়্‌তে তার weak point চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ত। তারই উপর আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর্‌তাম"। এই বলিয়া তিনি মুসলমানপাড়া বোমার মামলার দৃষ্টান্ত দিলেন।

পরে বলিলেন, "জুনিয়র অবস্থাটা বড় কষ্টকর, সিনিয়রদের snubbing খেতে হয়। তার উল্টো জবাব দিলেই মুখ বন্ধ।"

চিত্তরঞ্জন বলিতেন, "সকলেই কাজ কর্‌বার আগে অনেক ভাবনা চিন্তা করে, কাজের ফলাফলের বিবেচনা করে, কিন্তু আমি তা কখনো করিনি। ফলাফল না ভেবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমি কখনো আগু পিছু ভেবে কাজ করিনে।"

এখন হইতে চিত্তরঞ্জন বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁহার আয় হইল। টাকা উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু সঞ্চয় করিতেন না। সঞ্চয় করা যেন তাহার প্রকৃতিতে ছিল না। অধিকাংশ টাকাই পরার্থে ব্যয়িত হইত। কোন প্রার্থী তাঁহার দ্বারে আসিয়া বিমুখ হইতে শুনা যায় নাই। জনৈক ভদ্র লোক লিখিয়াছেন, তিনি তাহার পিতার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের গৃহে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা চিত্তরঞ্জনের বিশেষ বন্ধু। নানা কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন ভিক্ষুক আসিয়া চিত্তরঞ্জনের কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিল। প্রার্থীর কন্যাদায় উপস্থিত। চিত্তরঞ্জন তৎক্ষণাৎ সেই ভিক্ষুককে পঞ্চাশ টাকা দিতে আদেশ করিলেন। সকলে চমকিত হইয়া গেল। ভিক্ষুক নিতে চায় না। সে মনে করিল, বুঝি বা

ভুল হইয়াছে। ভিক্ষুকের হাতের খাতাটী খুলিয়া দেখা গেল, সে আরও অনেক বড় বড় লোকের বাড়ীতে গিয়াছে। কে কত দিয়াছে, সেই খাতায় লিখা ছিল। কলিকাতার একজন ধনকুবের চারি আনা দিয়াছিল। কেহ কেহ আট আনা, বড় জোর এক টাকা।

কোন পল্লীগ্রামের একজন ভদ্রলোক নানাকারণে আপনার বাড়ীঘর ছাড়িয়া সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিছুদিন পরে ভদ্রলোকটীর মৃত্যু হয়। পরিবারে তিন চারিটী লোক, কোন মতেই এদের খাওয়া পড়া চলে না। নিতান্ত দুরবস্থায় পড়িয়া ইহারা পরদুঃখকাতর চিত্তরঞ্জনের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি প্রতিমাসে তাহাদের দশ টাকা করিয়া পাঠাইতেন। মাসের পহিলা তারিখে টাকা আসিত, কখনও দুই এক দিন এদিক সেদিক হইত না।

পরের দুঃখ কষ্ট দেখিলে, দেশের কাজ উপস্থিত হইলে তাঁহার খরচের হিসাব থাকিত না। তাঁহার অর্থে কত গরীব বাঁচিয়া গিয়াছে, কত বিধবা নারীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইয়াছে, কত গরীব ছেলের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা অতি কম লোকেই জানে। দান করিয়া বাজারে নাম জাহির, এমন দান তিনি করিতেন না। মহাত্মা যীশু তাঁহার শিষ্যবর্গকে বলিতেন, "ডান হাতের দান যেন বা হাতে টের না পায়।" চিত্তরঞ্জনের দানও প্রায় তদ্রূপই ছিল। আমাদের বাংলা

দেশে এক শুনিয়াছি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের দানের কথা, আর এখন শুনিতে পাই চিত্তরঞ্জনের দানের কথা। নাম কিনিবার দান না হইয়া যদি প্রাণের দান হয়, তবে তাহা খবরের কাগজে জাহির হয় না। সেইটা হয় কিরূপ? "মন, তুই জানিস্ আর আমি জানি, আর যেন কেউ নাহি জানে' এই প্রকারের।

চিত্তরঞ্জন তাঁহার জনৈক স্নেহভাজনকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, প্র্যাক্‌টিস্ কর্‌তে গেলে দেশের কাজ করা চলে না। এবছর পাঁচলাখ টাকা রোজগার কর্‌লাম কিন্তু একটা পয়সাও থাকে না; দেশের কাজ তেমন কিছু কর্‌তে পার্‌লাম না। আমার কতগুলি দেনা রয়েছে, ঐ গুলো শোধ হয়ে গেলেই ব্যবসায় ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে দেশের কাজে লাগ্‌বো। কিন্তু বছরের পর বছর যাচ্ছে, ঋণ আমার বেড়েই চলেছে। নিজের জন্য ভাবি না; কষ্ট কি প্রথম জীবনেই দেখেছি। ট্রামের ভাড়া বাচাবার জন্যে হাইকোর্ট থেকে বিকেলে ফেরবার সময় হেঁটে এসেছি, এবং এমন দিনও গেছে যে দিন হয়তো ৵৹ আনা বই পরিবারের সম্বল ছিল না। আর যদি দশটা বছরই বাঁচি, প্র্যাকটিস্ ছাড়্‌লেও এক রকম করে সুখে দুঃখে যাবে, কিন্তু একটা কেবল ভাবনা হয়, অনেকগুলো লোক আমার কাছে মাসিক সাহায্য পায়; সে বেচারাদের কি হবে?"

পরদুঃখে কাতর না হইয়া চিত্তরঞ্জন অপরাপর উপার্জ্জনশীল ব্যারিষ্টারের মত সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিলে, তিনি একজন

মস্ত বড় জমিদার হইতে পারিতেন। কিন্তু সঞ্চয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন। দরিদ্রের দুঃখ দেখিলে তাঁহার মন গলিয়া যাইত, সঞ্চয়ের কথা মনেই থাকিত না।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠানে চিত্তরঞ্জন বহু অর্থ দান করিয়াছেন। জাতীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব দান কাহারও অবিদিত নহে। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি কল্পে, বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য, কলিকাতার ব্রাহ্মস্কুলের নূতন বাড়ীর নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত তিনি অনেক টাকা দান করিয়াছেন। পুরুলিয়াতে তাঁহার পিতা ভুবনমোহন দাশের এক প্রকাণ্ড পাকাবড়ী ছিল। সেই বাড়ীতে তিনি অনাথ-আতুর-আশ্রম বসাইয়া মাসিক দুই হাজার টাকা উহার জন্য খরচ করিতেন। অন্ধ, খঞ্জ ও আতুরদের মল মূত্র পর্য্যন্ত তিনি নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়াছেন।

কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে আশ্রমের কা ন বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া তিনি নদীয়ায় নিত্যানন্দ আশ্রমের সহিত এক বন্দোবস্ত করিলেন। পুরুলিয়ার আশ্রমে যে সমুদয় অন্ধ আতুর ছিল, তাহাদিগকে নিত্যানন্দ আশ্রমে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই উপলক্ষে চিত্তরঞ্জন নিত্যানন্দ আশ্রমে দুই লক্ষ টাকা দান করিলেন। ভবানীপুরের অনাথ-আশ্রমেও তিনি কম টাকা দান করেন নাই। ১৯১৯ সালে পূর্ব্ববঙ্গ দুর্ভিক্ষের সময় দশ হাজার টাকা দান করিয়া, এবং ধনী মাড়োয়ারীদের

নিকট হইতেও বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

চাঁদপুরের শ্রমিক বিভ্রাটকালে চিত্তরঞ্জন সামান্য কুলীদের দুঃখে আত্মহারা হইয়া কি করিয়াছিলেন, মহামতি এণ্ডরুজ সাহেব তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন। "চাঁদপুরে যখন কুলী নির্য্যাতন হয়, সে সময়কার একটা ঘটনা আমার বেশ্ মনে আছে। চাঁদপুরে কুলীদের মধ্যে যখন বিসূচিকার প্রবল প্রকোপ, তখন দেশবন্ধু গোয়ালন্দে পৌঁছিয়া দেখেন, ধর্ম্মঘটের জন্য ষ্টীমার বন্ধ। ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত হইতেছে, নদী তরঙ্গমালা-সঙ্কুল। সেই বাত্যা বিক্ষোভিত নদীতে সচরাচর যাহারা জলপথে যাতায়াত করে, তাহারাও যাইতে সাহস করে না। দেশবন্ধু জীবনের ভয় না করিয়া, একখানা দেশীয় নৌকায় সরাসরি গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুরে উপস্থিত হইলেন।

দিল্লীতে মহাত্মা এক বিংশতি দিবসব্যাপী অনশন ব্রতপালন করিতে আরম্ভ করিলে, দেশবন্ধু কলিকাতা হইতে দিল্লীতে আগমন করেন। তখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত রুগ্ন ছিল। শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্বেও তিনি কেবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেশের কার্য্য করিয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার উদারতা ও দেশের কার্য্যে অসীম সাহসিকতা দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছি।"

চিত্তরঞ্জন মানুষকে বড় ভালবাসিতেন। মানুষের জন্য

তাঁহার প্রাণ কত কাঁদিত, মানব যে তাহার কত আপনার জন ছিল, "মালঞ্চে" উহার আভাস পাওয়া যায়।

"ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি চেয়ো না ফিরিয়া
ধরণীর দুঃখ দৈন্য আছে যাহা থাক্;
ঊর্দ্ধমুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণ পুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্।"

বেশি দিনের কথা নয়, আমাদের বাংলা দেশে স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চকণ্ঠে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার কথা, মানুষকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করিবার কথা জগৎবাসীকে শুনাইয়া গিয়াছেন। মানুষকে বাদ দিয়া নারায়ণের সেবা হয় না। স্বামীজীর অমৃতোপম বাক্য—"বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর"।

আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন,—

"অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব।
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস
তবে মিছে সহকার শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস।"

পাঁচ

চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যোগদানের সময় ধরা যায় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন হইতে। তিনি এ সময় চরমপন্থীদের দলে গিয়া মিশিয়াছিলেন। তখন "নিউবেঙ্গল" ও "বন্দেমাতরম্" পত্রের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারপর ১৯১৫ সালে ভবানীপুরে প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন সভাপতি হইয়াছিলেন।

১৯১৮ সালে দিল্লী ও বোম্বাইর কংগ্রেস-মণ্ডপে তিনি "মণ্টেগু রিফরম্" এর প্রতিবাদ করিয়া ছিলেন।

১৯১৯ সালে পঞ্জাবের দুর্ঘটনার পড় কংগ্রেসের নিয়োগানুসারে তিনি বহুক্ষতি স্বীকার করিয়া, সেখানে গমন করেন। সুদীর্ঘ চারি মাস কাল পণ্ডিত মদনমোহন, পণ্ডিত মতিলাল এবং মহাত্মা গান্ধীর সহিত অত্যাচারের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

১৯২০ সালে কলিকাতায় "স্পেশেল কংগ্রেসে" মহাত্মা গান্ধী "সরকারের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন" এই মত অবলম্বন করিলেন। চিত্তরঞ্জনের সহিত কোন কোন স্থলে উহা নিয়া মতভেদ হইল। কিন্তু তাঁহার আপত্তি টিঁকিল না। ইহার

তিনমাস পরে নাগপুরে যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত তিনি একমত হন। নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া চিত্তরঞ্জন বাংলায় ফিরিয়া আসেন, ও প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি বুঝিলেন, আরামে থাকিয়া, ব্যারিষ্টারী করিয়া একাজ চলিবে না, এমন্ত্র প্রচার হইবে না,—বলিলেও দেশের লোকে শুনিবে না। "আপনি আচরি ধর্ম্ম লোকেরে শিখায়", এই ভাবিয়া চিত্তরঞ্জন বিপুল আয়ের ব্যবসায় ছাড়িলেন, হ্যাট কোট ছাড়িলেন, সমুদয় বিলাস ব্যসন পরিত্যাগ করিলেন। সাহেবী ড্রেস ছাড়িয়া মোটা ধুতি, মোটা চাদর, মোটা জামা গায় দিয়া রাস্তায় বাহির হইলেন।

১৯২১ সালে তিনি প্রবল ভাবে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিলেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় ছাত্রেরা দলে দলে স্কুল ছাড়িল, কলেজ ছাড়িল, উকীল ওকালতী ছাড়িল, মোক্তার মোক্তারী ছাড়িল, চারিদিকে ছাড়াছাড়ির এক সাড়া পড়িয়া গেল। বাংলায় এক ভাবের বন্যা বহিয়া গেল। এই সময়ে চিত্তরঞ্জন—মিঃ সি, আর, দাশ "দেশবন্ধু" আখ্যা পাইলেন। চিত্তরঞ্জন রাজভোগ বর্জ্জন করিয়া ফকিরী গ্রহণ করিলেন। দেশের জন্য কি বিরাট ত্যাগ। ভারতবাসী যেদিন তাঁহার অনুকরণ করিতে পারিবে, সেদিন ধন্য হইবে। দেশের জন্য এরূপ সর্ব্বস্বত্যাগ কোন দেশে দেখা যায় না।

সি, আর, দাশ সন্ন্যাসী সাজিলেন; তাই দেশবন্ধুর অলৌকিক ত্যাগ দেখিয়া কবি গাহিয়াছেন—

"বুদ্ধের ত্যাগ শুনেছি মহান, দেখিনিক চোখে তাহে,
নাহি আফ্‌সোস, দেখেছি আমরা ত্যাগের শাহানশাহে;
নিমাই লইল সন্ন্যাস প্রেমে, দিইনিক তারে ভেট
দেখেছি মোরা "রাজা সন্ন্যাসী," প্রেমের "জগৎ-শেঠ"।

দোকান পাটে পিকেটিং আরম্ভ হইয়া গেল। ছেলেরা সব দলে দলে কারাবরণ করিতে লাগিল। দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন ছয় মাসের জন্য জেলে গেল। চিত্তরঞ্জনের পত্নী বাসন্তী দেবী ও ভগিনী উর্ম্মিলা দেবী গ্রেপ্তার হইলেন। অবশেষে দেশবন্ধু স্বয়ং গ্রেপ্তার হইয়া ছয়মাস কাল জেলে পচিলেন।

১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর শনিবার বৈকালে সাড়ে চারি ঘটিকার সময় চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হইলেন। পুলিশ দুইখানা মোটরকার নিয়া দেশবন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ডেপুটী কমিশনার সাহেব কয়েকজন গোরা সার্জ্জেণ্ট সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ধীর ভাবে পুলিশকে বলিলেন, "এই আমি হাজির আছি। আমি গ্রেপ্তার হইলাম"। যাত্রাকালে দেশবন্ধুর পুরনারীগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার খাবার কি বাড়ী হইতে হাজতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে?" দেশবন্ধু উত্তর করিলেন,

"না, উহার প্রয়োজন নাই। সাধারণ জেল-কয়েদীর খানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। এক পয়সার মুড়কীই যথেষ্ট"।

যাত্রাকালে দেশবন্ধু দেশবাসীকে বিদায়বাণী শুনাইলেন—"দুঃখ বিপদের মধ্যে দিয়া জাতির উদ্ভব হইয়া থাকে। এই বিপদ আপনাদিগকে সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। আপনারা অহিংসার পথ অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।"

১৯২১ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্কশালষ্ট্রীটের পুলিশ আদালতে দেশবন্ধুর বিচার হইল। তিনি শান্তভাবে কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারে বসিয়া দেশবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কিছু বলিতে চাহেন?" তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "না"। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দেশবন্ধুকে ৬ মাসের অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। দণ্ডাদেশ শুনিয়া তিনি কোন কথাই বলিলেন না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সর্ব্বতোভাবে অহিংস নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। অসাধারণ আইনজ্ঞ হইয়াও তিনি আত্মসক্ষ সমর্থন করিলেন না। হাসিমুখে কারাবরণ করিলেন।

কারাবাসে দেশবন্ধুর অসুখের জন্য তাঁহার খাবার বাড়ী হইতে আসিত সেখানে ষ্টোভেও কিছু কিছু রান্না হইত।

তাঁহার বাড়ী হইতে যে খাবার আসিত, অথবা ষ্টোভে করিয়া যাহা পাক হইত, তাহা তিনি একা খাইতেন না। অন্যান্য কয়েদীদেরও দিতেন। দেশবন্ধুর শারীরিক অসুস্থতার জন্য বাসন্তী দেবী জেলের মধ্যে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত গমনাগমনের অনুমতি পাইয়াছিলেন। তিনি জেলে আসিয়া প্রায়ই স্বামীকে দেখিতেন।

কারাবাসে দেশবন্ধু একটু সময়ও নষ্ট করিতেন না। সকালে বিকালে সব সময়েই তিনি পড়াশুনা করিতেন ও লিখিতেন। শুনা যায় তিনি জেলে বসিয়া "ভারতীয় রাজনীতি" নামে একখানা পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই পুস্তক তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন কিনা ভগবানই জানেন।

ছয়মাস জেল ভোগ করিয়া মুক্তিলাভের পর দেশবন্ধুর মতের পরিবর্তন হয়। ১৯২২ সালের গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া, তিনি তাঁহার মত প্রচার করিলেন,—সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া সহযোগিতা বর্জ্জন করিতে হইবে। তিনি কংগ্রেসের কাছে কাউন্সিলে প্রবেশ লাভের অনুমতি চাহিলেন। কংগ্রেস সে প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। তখন তিনি নিজেই স্বরাজ্য-পার্টি নাম দিয়া একটী নূতন দলের সৃষ্টি করিলেন। একমাত্র তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এত দল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উদ্যম বিফল

হইল না। ১৯২৩ সালের দিল্লীর স্পেশাল কংগ্রেস স্বরাজ্য দলকে কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

তারকেশ্বর সমস্যায় দেশবন্ধু নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিবানিশি তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্ত্তনের কথা কাহারও অবিদিত নহে। অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর মোহন্তের সহিত দেশবন্ধুর মিটমাট হইয়া সত্যাগ্রহ বন্ধ হইয়া গেল। একমাত্র তাঁহার চেষ্টায় তারকেশ্বরের অনাচার কতকটা প্রশমিত হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের ফরিদপুর অধিবেশনে দেশবন্ধু যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহাতে তিনি সকলকে মিলনের বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্ব হইতেই দেশবন্ধুর শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া তিনি নানাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনে মেয়রের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কি সুশৃঙ্খলা ও সুবিচারের সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়া ছিলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একে রোগের যাতনায় ভগ্ন-দেহ, তাহার উপর সর্ব্বদা গুরুতর পরিশ্রম ও চিন্তা। এই সমুদয় কারণে তিল তিল করিয়া দেশবন্ধুর দেহ-শক্তি ক্ষয় পাইতে লাগিল। তিনি স্বাস্থ্য লাভের জন্য দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন। মহাপুরুষ দেশবন্ধুর এই মহাপ্রস্থান।

দার্জ্জিলিং যাইবার কয়েক দিন আগে ফরওয়ার্ড আফিসের জনৈক কর্ম্মচারীকে তিনি কার্য্যের জন্য পদচ্যুত করিয়াছিলেন। পাঁচ সাত দিন পরে এই কর্ম্মচারী গিয়া বলিল, "আমার চলে না, আমি এখন খাইতে পাইনা।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "খাইতে পাইতেছ না, তাহা আগে বল নাই কেন?" কোন লোক খাইতে পায় না শুনিলে তাহার চক্ষে জল আসিত। তিনি সে বেচারীর খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন!

ছয়

১৩৩২ সালের ২রা আষাঢ় মঙ্গলবার বৈকালে প্রায় পাঁচটার সময় দেশবন্ধু দার্জ্জিলিংএ অকালে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যু সংবাদ চোখের পলকে সহরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। প্রথমে কেহই এই আকস্মিক সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল না। দুই দিন পূর্ব্বেও তিনি কতকটা সুস্থদেহে রাস্তায় বেড়াইয়াছিলেন। দেশবন্ধুর অসুখের খবর কম লোকেই জানিত।

মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাসভবনে বহু লোক আসিতে আরম্ভ করে। হিন্দু, মুশলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, বাঙ্গালী, নেপালী, ভুটিয়া, পাহাড়ী, পার্শী, মাড়োয়ারী, সকল শ্রেণীর লোকের ভিড় হইতে লাগিল। রাজা মহারাজা হইতে সাধারণ কুলি মজুর পর্য্যন্ত এবং বড় বড় রাজ কর্ম্মচারী হইতে পুলিশ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত দেশবন্ধুর দর্শনের নিমিত্ত উপস্থিত হইল। দলে দলে লোকেরা জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দেশবন্ধুর দর্শন লাভ করিয়া প্রণাম করিতেছে, অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। বাড়ী লোকে



পরিপূর্ণ, এরূপে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত লোক সমাগমের বিরাম হইল না।

একজন প্রত্যক্ষ দর্শী লিখিয়াছেন, "রাত্রি আড়াইটার সময় বাড়ীর দরজায় পুনরায় লোকের সাড়া পাওয়া গেল। একদল লোক দার্জ্জিলিংএর ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী বঙ্গিত নামক স্থান হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোন লোক সন্ধ্যার পর সহর হইতে ফিরিয়া গিয়া সেখানে দেশবন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করাতে, তাহারা সদলে সেই গভীর রাত্রেই একটা দুর্গম পাহাড়ের পথ অতিক্রম করিয়া একবার শেষ দর্শনের জন্য আসিয়াছে। বাসন্তী দেবী শুনিয়াই তাহাদিগকে উপরে আসিতে বলেন। দেশবন্ধুর শবদেহ দর্শন করিয়া তাহাদের আকুল ক্রন্দন ও শোকাচ্ছন্ন মুখভাব অবর্ণনীয়।"

পর দিন ভোর হইতেই বাড়ীতে আবার জন সমাগম হইতে আরম্ভ হয়। সকাল ৭৷৷ টার সময় শব দেহ পবিত্র খদ্দরে ভূষিত এবং পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত করিয়া কলিকাতায় পাঠানের জন্য ষ্টেসনে লইয়া যাওয়া হয়। শোভাযাত্রার সমস্ত পথে এত জনতা হইয়া ছিল যে বাড়ী হইতে ষ্টেসনে পৌঁছিতে ১৫ মিনিটের স্থলে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়াছিল।

দার্জ্জিলিং ষ্টেসনে পূর্ব্ব হইতেই জনতা হইয়াছিল। মূহুর্মুহু হরিধ্বনি ও "বন্দেমাতরম" চীৎকারের মধ্যে শবদেহ একখানি নূতন রংকরা মালগাড়ীতে উঠান হয়। গাড়ীতে



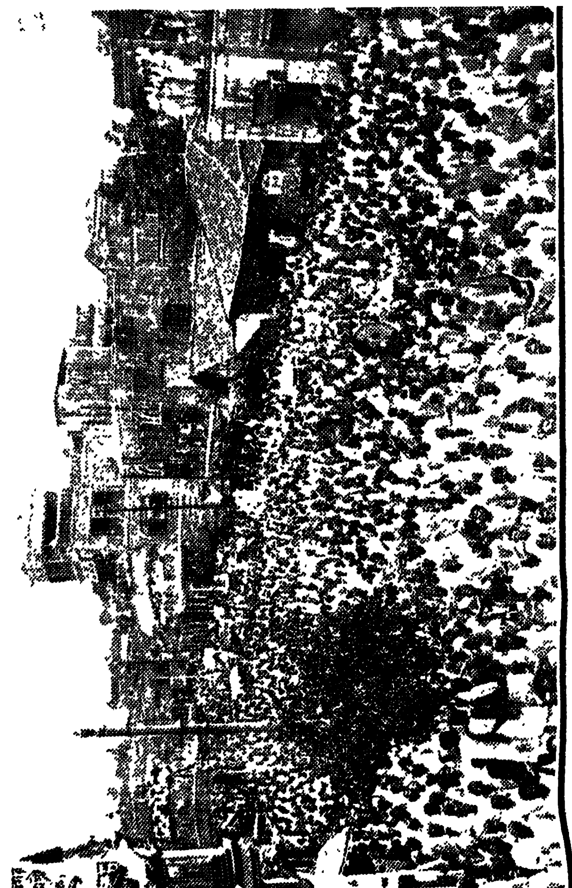
উঠাইবার কালে সকলে দেশবন্ধুর মুখখানা জন্মের মত দেখিয়া লইল। ষ্টেশনের দৃশ্য বড়ই হৃদয় বিদারক।



এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করি গেলে দান
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক বৃদ্ধা নারী এমন ব্যাকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে থাকে যে তাহাকে শান্ত করা কঠিন হইল। কি বড় কি ছোট সকলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ষ্টেশনে দেশবন্ধুর শবদেহ দর্শন করিয়া পাহাড়ী কুলিরা বলিতে লাগিল। "তিনি কখনও মরিতে পারেনা। দেহ কলিকাতা পৌঁছিলেই গান্ধী মহারাজ উহাকে স্পর্শ করিয়া বাঁচাইয়াদিবেন"।



দেশবন্ধুর শবদেহ শিয়ালদহ পৌঁছিলে বিরাট শোভা যাত্রা সহ সেই শবদেহ কালীঘাট শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়।

দেশবন্ধুর শবদেহ শিয়ালদহে পৌঁছিল। শবদেহের সঙ্গে বিরাট শোভাযাত্রা চলিল। ষ্টেশনে রাজা মহারাজা, জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট, জমিদার প্রভৃতি কত যে সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন তাহার গণনা করা যায় না। শব কেওড়া তলার শ্মশানে নীত হইল। কালীঘাটে কালী মন্দির হইতে শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত যেরূপ জনতা হইয়াছিল, সেরূপ জনতা আর কখনও হয় নাই। চিতা-শয়নে সেই দেহ শায়িত করিয়া চিতায় অগ্নিযোগ করা হইল। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং সেই চিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শেষ আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন এবং দেশবাসী সকলকে চিত্তরঞ্জনের আদর্শে অনুপ্রানিত হইতে বলিলেন।

যেখানে নিন্দা নাই, যেখানে গ্লানি নাই, সকল দেশের দেশ প্রেমিক মহাপুরুষগণ যে খানে স্বচ্ছন্দে বিরাজ করেন, বাংলার বিরাট পুরুষ চিত্তরঞ্জন সেই অনন্য ধামে চলিয়া গেলেন। চিত্তরঞ্জনের অসীম স্বার্থত্যাগ, জ্বলন্ত দেশ হিতৈষীতা, অপূর্ব্ব সাধনার কথা ভারতবাসী দিন দিন উপলব্ধি করিতে পারিবে। চিত্তরঞ্জন কি ছিলেন, যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিলে ভারতবাসীর জীবন ধন্য হইবে।

"দেশবন্ধুর অন্তরছিল পুষ্পেরমত কোমল, মধুরমত, আনন্দের মত শুভ্র ও উজ্জ্বল। সকলের সকল অভিযোগ, সমস্ত অভাব, সকল দুঃখ, তাহার অন্তরে গিয়া আঘাত করিত,

এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রতীকার করিতে না পারিতেন, ততক্ষণ তিনি সে জন্য অধীর হইয়া পড়িতেন। তিনি যাহা অনুভব করিতেন, তাহা চির দিনই অন্তর দিয়া অনুভব করিতেন। তাঁহার মধ্যে মৌখিক সান্ত্বনা বা কপট আশ্বাস বাক্য মোটেই স্থান পাইতনা। সেজন্য অনেক সময় তাঁহার প্রাণের বন্ধুগণের সহিত মতভেদ ঘটিয়াছে, সে জন্য তিনিও নীরবে প্রাণের মধ্যে যথেষ্ট কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু যাহা সত্য, সুন্দর বলিয়া তাঁহার নিকট একবার প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা কোন দিন অকারণে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার মত মনের বল বড় কাহারও দেখা যায় না। এই অসাধারণ মানসিক বল তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার অভ্রান্ত একনিষ্ঠ ধর্ম্ম বিশ্বাসের বলে। তিনি যাহা কর্ত্তব্য ও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তাহা জীবন পণ করিয়াই পালন করিতেন।”

দেশ বন্ধুর হৃদয় বৈষ্ণব ভাবে অনুপ্রাণিতছিল। বৈষ্ণব কবিগণের প্রতি ও বৈষ্ণব গ্রন্থের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে বাংলার বৈষ্ণব গীতি কবিতায় যেমন করিয়া ভগবানের রূপ ও লীলা ধরা পড়িয়াছে, এমন আর অন্য কিছুর ভিতর ধরা পড়ে নাই। তিনি কবির অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, কবি কি বলিতে চাহিতেছেন, তাহাই দেখিতেন। তিনি নিজে কবি ছিলেন, পরম বৈষ্ণব

ছিলেন। চিত্তরঞ্জন বিদ্যাপতি ও চণ্ডি দাসের যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায়, তিনি কিরূপ অন্তর্দ্দর্শী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, "সুখ যখন রূপান্তর হইয়া ভাগবত সত্যে ফুটিয়া উঠে, তখন তাহা সুখ নয়, দুঃখ, এবং দুঃখ যখন ভাগবত সত্যে গিয়া পোঁছায়, তখন তাহা দুঃখ নয়, সুখ। তাই চণ্ডিদাস গাহিয়াছেন।

সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারি ঠাঞি।

ভিতরে বাহিরে সমগ্র জীবনে চিত্তরঞ্জন খাঁটী বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি তাঁহার কাব্যে বৈষ্ণব, সমাজ সংস্কারে বৈষ্ণব এবং রাজনীতিক জীবনে ও তিনি বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ধর্ম্মই তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিল, দেশসেবা ও ভগবানের সেবায় কোন পার্থক্য নাই। এনিমিত্তই চিত্তরঞ্জন দেশকে এত প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে পারিয়াছিলেন। প্রেমই ছিল চিত্তরঞ্জনের জীবনের মূল ধারা। এই প্রেম সামান্য প্রেম নয়, ইহা "সব সমর্পিয়া একমনহৈয়া" এই আত্মোৎসর্গ।

সাত

দেশবন্ধুর পরলোক গমনে পৃথিবীময় যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা দেশবন্ধুর পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর পত্র খানা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

“আমার প্রিয় স্বামীর পরলোক গমনে দেশবাসীর অভূতপূর্ব্বরূপ শোক প্রকাশ এবং আমার নিজের প্রতিও আমার পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনে আমাদের শোক বেদনা অনেক পরিমাণে লাঘব করিয়া আমাদের জীবন সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। আমি দেশ দেশান্তরের ধনী এবং গরীব সকলের নিকট হইতেই সমবেদনা জ্ঞাপক সংবাদ পাইয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকা, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড হইতে আমি তার পাইয়াছি। এখনও বহু তার আমার নিকট প্রতি মুহূর্ত্তে আসিতেছে। আমার স্বামীর শববাহী পালঙ্ক লইয়া যে বিরাট শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতেছিল, আমি সে দৃশ্য একবার দেখিয়াছি। যাঁহারা আমাকে তার প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাহারা আমার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তজ্জন্য সংবাদ পত্রের সাহায্যে বড়

লাট বাহাদুর, বঙ্গের গভর্ণর এবং অন্য যে সকল বন্ধু তার প্রেরণ করিয়া, প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া এবং স্বয়ং আসিয়া আমাকে তাঁহাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমি তাহা দিগকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি জানি আমার স্বামী তাঁহাদিগকে প্রাণ দিয়া নিজের মতন করিয়া ভাল বাসিতেন। আর তাঁহার সেই সেবা কার্য্যের অমৃতময় ফল স্বরূপ আমরা এই বিরাট শোকোচ্ছ্বাস অনুষ্ঠান লাভ করিয়াছি। আমার স্বামীর পবিত্র শব আনয়ন করিবার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ যে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেজন্য আমি তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

"বিরাট শবযাত্রা শ্মশান ঘাটে পৌঁছিবার সময় দুই তিনটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে জানিয়া অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়াছি। আহত ব্যক্তি দিগকে আমি আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। যাঁহাদের প্রিয় পাত্র আহত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি আমাকে তাঁহাদের ঠিকানা জানান্ তাহা হইলে উহা আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করা হইল বলিয়া বিবেচনা করিব"।

(স্বাঃ) বাসন্তী দেবী

কলিকাতা, ৫ই আষাঢ়, ১৩৩২ সাল।

আট

দেশবন্ধুর মৃত্যু সময় মহাত্মা গান্ধী খুলনায় ছিলেন। খুলনায় এই সংবাদ প্রচার হইবার সময় মহাত্মা ষ্টীমারে ছিলেন। অসীম ধৈর্য্যশালী হইলেও তিনি হৃদয়ে শোক চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। বহুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া অৰ্দ্ধ মৃতাবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। খুলনায় সভায় বক্তৃতা করিবার সময় তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়া ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুর মৃত্যুরপর লিখিয়াছেন,—"দেশবন্ধু শ্রদ্ধা ভক্তির উপযুক্ত পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার উদারতার অন্ত ছিল না। তিনি সস্নেহে সকলকেই সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার বদান্যতার সীমা ছিল না এবং তাহা মিতব্যয়িতার সীমা লঙ্ঘন করিত। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে আমি যখন তাঁহাকে বলিয়া ছিলাম, এ বিষয়ে তিনি একটু সাবধান হইলে ভাল হইত, তিনি তখনই উত্তর দিয়া ছিলেন, সাবধানী না হইয়া আমার যে কোনরূপ ক্ষতি হইয়াছে, এরূপ বিশ্বাস আমার নাই। রাজা প্রজা সকলেই সমভাবে তাঁহার আতিথ্যের অধিকারী ছিল। বিপন্ন ব্যক্তিরপ্রতি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক

নিয়মে প্রবাহিত হইত। কোন্ তরুণ বাঙ্গালী কোন না কোন প্রকারে দেশবন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ নহে? তাঁহার অন্যান্য সাধারণ ব্যবহারাজীব ক্ষমতা সর্ব্বদাই দরিদ্রের কার্য্যে প্রযুক্ত হইত।"

"তাঁহার সাহস তাঁহার উদারতারই অনুরূপ ছিল। তিনি দেশের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। তিনি অসাধারণ শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতেন। তাঁহার উদ্যম উৎসাহ ও দৃঢ়তা হেতু তাঁহার দল শক্তিশালী হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যে অসাধারণ উদ্যম ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার মহত্ত্বের কারণ। তিনি ইচ্ছা করিয়া এই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। এই ত্যাগ অসাধারণ। দেশবন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে—চিরঞ্জীব দেশবন্ধু।"

আমাদের ভারত সচিব দেশবন্ধুর মৃত্যুতে সমবেদনা জানাইয়া লিখিয়াছেন, "মিঃ দাশের সঙ্গে সমস্ত বিষয়েই আমার একমত ছিল, এমন কথা আমি বলি না। বলিলে লোকে আমাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবে। কিন্তু মৃত্যুর সময়ে মতভেদ ভুলিয়া যাওয়া আমাদের অভ্যাস। মিঃ দাশ যাহা কল্যাণকর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা সাধনের জন্য যে তিনি প্রাণপণে আত্মনিয়োগ করিতেন তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। তিনি অন্য কোন হিসাব না করিয়া স্বদেশের মঙ্গলের জন্য আজীবন যে আলৌকিক ত্যাগ স্বীকার

করিয়া গিয়াছেন, এবিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা একজন সরল, হৃদয়াকর্ষক এবং সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অন্তর্হিত হইল এই বলিয়া শোক প্রকাশ করিতেছি।"

আমাদের ভাইস্‌রয় লর্ড রেডিং বলিয়াছেন,—মিঃ দাশের মৃত্যুতে, ভারতে বিশেষতঃ বাংলায় গভীর শোকাবেগ উপস্থিত হইবে। যাঁহাদের সহিত মিঃ দাশের মতের ঐক্যছিল কেবল যে তাঁহারই শোকে অভিভূত হইবেন এমন নহে, যাঁহারা তাঁহার মতের বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও শোকার্ত্ত হইবেন। মতভেদ যতই তীব্র হউক না কেন, মৃত্যুর সময়ে লোকে সে সব ভুলিয়া যায়। ইহা সকলেই স্বীকার করিবে যে, মিঃ দাশ ভারতের কল্যাণের জন্য মনে প্রাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সংস্কারানুসারে ভারতের উন্নতি সাধনের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মিঃ দাশের বিচ্ছেদ-কাতর পরিবারের দুঃখে তিনি দুঃখিত।

এ গেল বড় লোকদের কথা! দেশবন্ধুকে পল্লীবাসীরা কি বুঝিয়াছিলেন, নিম্নে উহার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। ইহা মফঃস্বলের একটী তরুণ কৃষকদম্পতির পত্রের কিয়দংশের সঠিক নকল। চাষার পত্র বলিয়া ইহাতে বানান ও ভাষার দোষ আছে।

স্ত্রী। তোমার সংবাদের আগেই ভাই কানাইয়ের মুখে তোমাদের আদরের গরবের দেশবন্ধু দাশের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিনু, তাতে আমারই বুকটা যখন কে'পে উঠলো, না জানি তোমাদের প্রাণে কত কষ্টই না হচ্ছে। তখন বুঝতে পারলুম যে আজ বাঙ্গালীদের বুকের হাড় ভেঙ্গে গেল। কিন্তু আমার মনে সর্ব্বদাই একটা প্রশ্ন উঠে যে, তিনিত ভগবান ছিলেন; তবে তার অকাল মৃত্যু কেন হল? যে উদ্দেশে তিনি সংসার, রাজ রাজা, সুখসম্ভোগ সবই ত্যাগ করেন, সে উদ্দেশে কেন বাধা পড়িল, সে আশা কেন তাঁর পূর্ণ হল না।"

স্বামী। শাস্তি, তুমি দেশবন্ধুর মৃত্যুর কথাটা যদি মোটামুটি ভাবে দেখো তবে দেখিতে পাবে যে প্রভু গৌরাঙ্গ, স্বামী বিবেকানন্দ, অনেকেই বাঙ্গালাকে কাঁদায়ে অসময়ে চলে গেছেন। সেটা বাঙ্গালার দূরাদৃষ্ট। অসময়ের ফল কখন পাকে না। কিন্তু যদি একটু সূক্ষভাবে দেখ তবে তুমি জানতে পারবে যে ভগবান নিজেই বলেছেন যে ভারতে যখন ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হবে এবং দুষ্কৃতে পূর্ণ হবে, তখন ধর্ম্ম ও পাপীদের উদ্ধারের জন্য এবং দুষ্কৃতিদের ধ্বংশের জন্য যুগে যুগে আমি ভারতে আসবো। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে একবার মাত্র জন্ম নিয়েছিলেন তা নয়, যুগে যুগে তিনি জন্ম লন। আর বহুকাল ধরে হিন্দুধর্ম্মের উপর অত্যাচর

হওয়ায় এবং দুষ্কৃতেরদ্বারা ভারতপূর্ণ হওয়ায় তাদের উদ্ধারের জন্য মহাত্মা গান্ধীর জন্ম ; আর দেশবন্ধু তাঁর সখারূপে বাঙ্গালায় জন্ম নিয়েছিলেন।

তুমি আমাদের মলয়পুর বা বোকড়ায় দেখবে যে জনাকতক ছাড়া গ্রামের হাড়ি বাগ্দী, কায়স্থ, বামুন কেহই দুবেলা খেতে পায়না ; আর প্রায় সকলেরই স্বাস্থ্য খারাপ। এমনি বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই ! তাই বাঙ্গালীরা সর্ব্বদাই ভগবনের কাছে এই বলে কাঁদে যে "মুক্তি কোন্ পথে" বলে দাও। বাঙ্গালীদের পথ দেখাবার জন্যই সখারূপে "দেশবন্ধু" বাঙ্গালার ঘরে জন্মেছিলেন। তিনি বাঙ্গালীকে পথ দেখিয়ে মুক্তির সীমা পর্য্যন্ত এই জন্য নিয়ে যেতে পার্লেন না যে বাঙ্গালীরা বহুকাল ধরে যে পাপ করেছে তার প্রায়শ্চিত ২।১০ বৎসরে হবে না। সে জন্য বাঙ্গালীকে কঠিন সাধনা করতে করতে তাঁহার প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যেতে হবে তিনি চলে গেলেন বলে কি আমাদিগকে ভুলে থাকবেন তা কখনই নয়।

তিনি বাঙ্গালীর আত্মায় আত্মায় ঢুকে বল দিবেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদ অলক্ষিতে আলো দেখিয়ে পথ ঠিক করে দিবেন। আর বাঙ্গালী যখন সেই জ্যোতিঃ দেখে সেই পথে এগিয়ে যেতে থাক্‌বে, তখন শ্রীকৃষ্ণ যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরববংশ ধ্বংস করে পাণ্ডবদিগকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন,

তিনিও তেমনি করে হাসতে হাসতে বাঙ্গালীদের মধ্যে এসে, তাঁদের কাঁধে মিশিয়ে যুদ্ধে জয়ীকরে বাঙ্গালীকে মুক্তি দিবেনই দিবেন। কিন্তু বাঙ্গালী জাত যদি সে পথে না চলে তবে বাঙ্গালীজাতি ধ্বংস হবে।”

— সমাপ্ত —